গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ১২ সংখ্যা ৭ নভেম্বর ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মহান নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ

"বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা ও মজুরি দাসত্বের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সর্বহারাশ্রেণীকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতেই হবে এবং তারপরই একমাত্র তারা ক্ষমতা দখল করবে — একথা একমাত্র শয়তান বা নির্বোধরাই মনে করতে পারে। ভণ্ডামি বা নির্বুদ্ধিতার এ হ'ল এক চূড়ান্ত নজির। এর অর্থ বুর্জোয়া ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তির অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের বিকল্প হিসাবে তুলে ধরা।"

আর জি করের ঘটনা পরিকল্পিত

সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

আর জি কর হাসপাতালের ঘটনা প্রসঙ্গে ৩ নভেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন—

আমরা আজ হঠাৎ করে সংবাদমাধ্যমগুলোকে ডেকেছি, কারণ, সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক নিজেদের হীন কার্যকলাপকে চাপা দিতে ও গণআন্দোলনবিরোধী ষড়যন্ত্রকে কার্যকরী করতে আমাদের বিরুদ্ধে একটা কুৎসা রটনা করেছেন। আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় তিনি আমাদের দলকে দায়ী করেছেন। তাঁর এই বক্তব্য সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রাজ্যবাসী জানেন এবং সাংবাদিক বন্ধুরাও জানেন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে সঙ্কট চলছে, হাসপাতালের পরিকাঠামো যে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে তার বিরুদ্ধে আমাদের দল দীর্ঘদিন ধরেই জনগণের স্বার্থে আন্দোলন করে আসছে। গত শনিবারও হাসপাতালের বেহাল অবস্থা ফেরানো ও মিটিং-মিছিলের অধিকারের দাবিতে লড়তে গিয়ে আমাদের কমরেডরা পুলিশের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছে, এমনকি হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি করতে হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা, বিদ্যুৎ সহ জনস্বার্থের নানা দাবি নিয়ে আমাদের দল সবসময়ই আন্দোলন করে। আমাদের দল আন্দোলনের নামে প্রেস রিপোর্টার-ফটোগ্রাফারদের ওপর আক্রমণ করবে, রোগীর আত্মীয়দের উপর আক্রমণ করবে এবং ডাক্তারদের তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে — একথা রাজ্যবাসী শুধু নয়, সি পি এম নেতারা তাদের দলের সৎ কর্মী-সমর্থকদেরও বিশ্বাস করাতে পারবেন না। আমরা এধরনের আচরণ কোনদিন করিনা। আমরা বিপ্লবী রাজনীতি করি। আমাদের দল উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারের ওপর আন্দোলন গড়ে তুলতে চিরকালই বলে এসেছে এবং করে এসেছে। আসলে আর জি করের পুরো ঘটনাটাই ষড়যন্ত্রমূলক। আমরা জেনেছি, সি পি এমের তরফ থেকে পরিকল্পিতভাবেই তাদের উদ্দেশ্যপূরণের স্বার্থে একটা ঘটনার সুযোগ নিয়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে।

হাসপাতালগুলির সমস্যা নিয়ে প্রতিদিনই খবর বের হচ্ছে। কোথাও কোথাও রোগী মারা যাওয়া নিয়ে মানুষের মধ্যে বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটছে

দুয়ের পাতায় দেখুন

হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধি ও চরম অব্যবস্থা, রক্তের দাম-দুধের দাম বৃদ্ধি ও মিটিং-মিছিলের অধিকার খর্ব করার প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবে ১ নভেম্বর কলকাতার এসপ্লানেড ও হাজরা মোড়ে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দু'জায়গাতেই পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে ১২৬ জনকে আহত করে। মাথায় আঘাতসহ গুরুতরভাবে আহত হন ১৭ জন। তাদের মধ্যে ৪৫ জন মহিলা। গ্রেপ্তার করা হয় ৩০ জন মহিলা সহ ৪২ জনকে। এই পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ৩ নভেম্বর রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন কর হয়। পুলিশি তাণ্ডবের কয়েকটি চিত্র।

মহিলাদের গ্রেপ্তার

সুপ্রিম কোর্টের রায় বাতিলের দাবি জানাল কেন্দ্রীয় কমিটি

মহিলা পুলিশ দিয়েই মহিলাদের গ্রেপ্তার করতে হবে এবং সন্ধ্যার পর মহিলাদের গ্রেপ্তার করা যাবে না —গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে এই দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি বাতিল করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি যে রায় দিয়েছে, তাতে গভীর আশঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৩০ অক্টোবর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, এই রায় হতবুদ্ধিকর। এর দ্বারা মহিলাদের কাছ থেকে নিরাপত্তার ন্যূনতম রক্ষাকবচটিই কেড়ে নেওয়া হবে, যা তাদের শালীনতা ও সম্ভ্রমকে অপরাধীদের সহজ শিকারে পরিণত করে দেবে, যা অত্যন্ত মারাত্মক। এই অযৌক্তিক রায় অবিলম্বে বাতিল করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে দাবি জানাবার সাথে সাথে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণকে এই রায় অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানান।

মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে

জনসভা

১৭ নভেম্বর বিকাল ৫টা মহাজাতি সদন, কলকাতা

***প্রধান বক্তা ঃ* কমরেড নীহার মুখার্জী**

বিদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখবেন

হাসপাতালে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ

প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রভাস ঘোষের চিঠি

(এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীকে নিম্নের চিঠি পাঠানং

আপনার সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, প্রেস রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের হাসপাতালে প্রবেশ এবং গতিবিধির উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। এই সংবাদ রাজ্যবাসীর কাছে খুবই উদ্বেগজনক। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে দীর্ঘকাল ধরে প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও নানা মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে চলেছে। হাসপাতালের দ্বারে চিকিৎসার সুযোগ বঞ্চিত হয়ে মারা যাওয়া, হাসপাতাল বেডে নিষ্ঠুর অবহেলায় প্রাণ হারানো, সদ্যজাত সন্তানদের নিখোঁজ হওয়া সহ নানা অরাজকতা ও দুর্নীতি অবাধে ঘটেই চলেছে। এর সামান্য কিছু খবর সংবাদমাধ্যমের মধ্য দিয়ে রাজ্যবাসী জানার সুযোগ পায়, তার ফলে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। আপনার সরকারের এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের দ্বারা একদিকে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে জনগণের জানার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমরা এই গণতন্ত্রবিরোধী সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি করছি।

দ্বিতীয়ত, আপনার জানা উচিত, কেউ শখ করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রদর্শন করেনা। যখন চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে চোখের সামনে আপনজনকে মরতে দেখে বা চিকিৎসার নামে নিষ্ঠুর অবহেলায় প্রিয়জনকে হারায় তখন স্বাভাবিকভাবে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, কোন কোন রাজনৈতিক দলও এগিয়ে আসে। আপনার সরকার এই বিক্ষোভকে দমন করার জন্য শুধু পুলিশবাহিনী নয়, প্রাক্তন সৈনিকও নিয়োগ করতে চলেছে। এইভাবে দমনপীড়ন চালিয়ে শোকার্ত মানুষের অন্তরের বিক্ষোভকে দমন করা কি উচিত না সম্ভব?

বরং আপনার সরকারের জনগণের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ববোধের প্রকাশ হিসাবে অবিলম্বে বিশিষ্ট চিকিৎসক, মেডিকেল ও স্বাস্থ্য সংগঠনের প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা উচিত। এই কমিটি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল অবস্থার উন্নতি সাধনে যে সুপারিশগুলি দেবে সেগুলিকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাজ্য সরকারকে অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে।

আর জি করের ঘটনা পরিকল্পিত

একের পাতার পর

এবং এ নিয়ে বচসা-তর্কাতর্কির রিপোর্ট সংবাদমাধ্যমে বের হচ্ছে। এরকমেরই একটা ঘটনার সুযোগ নিয়ে আর জি করের ডাক্তারদের উত্তেজিত করা হয়েছে। সি পি এমের কোঅর্ডিনেশন কমিটি, এস এফ আই, তাদের ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশন এবং স্থানীয় সি পি এম নেতৃত্বের জড়ো করা সমাজবিরোধী — সকলে মিলে প্রচার তোলে যে, রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা ডাক্তারদের আক্রমণ করেছে। এই বলে তারা পরিকল্পিত-ভাবে ডাক্তারদের উত্তেজিত করে। একই সময়ে পুলিশকেও আনা হয় এবং পুলিশ দিয়ে ডাক্তারদের পেটানো হয়। তার দ্বারা ডাক্তারদের আরও উত্তেজিত করা হয়। পরিকল্পিতভাবে ডেকে এনে প্রেসের ওপরও নৃশংসভাবে হামলা চালানো হয়। গোটা ঘটনাটাই ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিত পদক্ষেপ।

এর দ্বারা অনেকগুলো কাজ করে নেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। প্রথমত, সরকার আগেই বলেছে হাসপাতালে কোন রিপোর্টার-ফটোগ্রাফার ঢুকতে পারবে না। তা কার্যকর করার জমি এই ঘটনার দ্বারা তৈরি করে দেওয়া হল। দ্বিতীয়ত, এর দ্বারা ডাক্তার ও সাংবাদিকদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা হল এবং হাসপাতালে প্রাক্তন সেনা ও আরও পুলিশ নিয়োগ করার পথ পরিষ্কার করা হল। তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে হাসপাতালে চিকিৎসায় অবহেলা ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলবে না, ডাক্তার-নার্স ও শ্রমিক-কর্মচারীরা যে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন করে, মেডিক্যাল ছাত্ররা ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করে সেগুলোও চলবে না — সরকারের এই পদক্ষেপ কার্যকর করার পথ করা হল। চতুর্থত, সরকারি অবহেলা ও অব্যবস্থায় হাসপাতালে যে মর্মান্তিক ঘটনাগুলি ঘটছে তা চাপা দেওয়ার জন্য জনগণের দৃষ্টিকে এর দ্বারা ঘুরিয়ে দেওয়া হল। পঞ্চম মত, আমাদের দল বেশ কয়েকবছর ধরেই ডাক্তার, জনগণের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে পশ্চিমবাংলার সমস্ত জায়গায় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি গড়ে তুলেছে। জনস্বার্থে এই কমিটির নেতৃত্বে বহু আন্দোলন হচ্ছে। এই আন্দোলনের ফলেই হাসপাতালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ধিত চার্জ কিছুটা হলেও কমাতে আমরা সরকারকে বাধ্য করতে পেরেছি। এই ঘটনার দ্বারা রোগীর আত্মীয়-স্বজন, জনগণ ও ডাক্তারদের মধ্যে বিরোধ বাধাবার চেষ্টা করে, যে আন্দোলনগুলো আমরা করছি — তা যাতে না করা যায় তেমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এজন্যই বলছি পুরো ঘটনাটাই জনগণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র।

আর জি কর হাসপাতালে আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত যে ক'জন ডাক্তার আছেন, তাদের মধ্যে দু'জন বাদে আর কেউ ঘটনার দিন ঘটনাস্থলেই ছিলেন না। গত শনিবার এসপ্লানেড ও হাজরা মোড়ে আমাদের দলের প্রতিবাদ আন্দোলনের ওপর পুলিশের প্রচণ্ড আক্রমণে আমাদের শতাধিক কর্মী আহত হয়। ১৭ জনের অবস্থা গুরুতর ছিল। আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত ডাক্তাররা এদের চিকিৎসাতেই ব্যস্ত ছিলেন। যে দু'জন ডাক্তার আর জি কর হাসপাতালে ছিলেন তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। আমাদের কর্মীদের উদ্যোগেই পরে কোঅর্ডিনেশনের লোকজনদের বাধাদান সত্ত্বেও রিপোর্টারদের ঢোকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

সি পি এম, এস এফ আই ডাক্তারদের মধ্যে প্রচার তুলছে, প্রেসগুলিই রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের ডাক্তারদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে। এর দ্বারা ডাক্তারদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে তারা তা কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। 'গণশক্তি'র রিপোর্টে যে পাঁচজনের বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে, তার

আটের পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশের বিরুদ্ধে এম এস এস

সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করল

মহিলাদের গ্রেপ্তারের সময় মহিলা পুলিশের বাধ্যতামূলক উপস্থিতির আইন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া সাম্প্রতিক নির্দেশের প্রতিবাদে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ৩০ অক্টোবর সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ডাকে সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে এসপ্ল্যানেডে মেট্রো স্টেশনের সামনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী বলেন, আমাদের দেশে যেখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশ নির্বিচারে নারীর ইজ্জত হরণ করে, প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে, থানা লক-আপের অভ্যন্তরে মহিলারা নির্যাতিতা হন, সেখানে এই নির্দেশ সমস্ত নারী সমাজের নিরাপত্তা এবং সম্ভ্রমের উপর মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনবে। তিনি নারীপুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এই অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী অধ্যাপিকা মেনকা বসু রায়, মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সাধনা চৌধুরী। প্রস্তাবে বলা হয়, নারীর সম্ভ্রম রক্ষার প্রয়োজনেই একদিন এই আইন চালু হয়েছিল ; আজ একে বাতিল করার নির্দেশ স্বৈরাচারী শাসক ও প্রশাসনের হাতে অবাধ ক্ষমতা তুলে দেবে।

সুপ্রিম কোর্টের এই অগণতান্ত্রিক নির্দেশ অবিলম্বে খারিজ করে প্রচলিত আইন চালু রাখার অনুরোধ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে তা পাঠ করে শোনানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়।

সভায় গৃহীত মূল প্রস্তাবে বলা হয় — "আজ ৩০ অক্টোবর ২০০৩, সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটি আহূত এই সভা মহিলা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক সর্বনাশা নির্দেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

"সংবাদে প্রকাশ, ১৯৯৩ সালে নাগপুরের কয়েকজন পুলিশকর্মী জুনিয়াস অ্যাডাম ইল্লামাত্তি নামে আজিনি রেল কলোনির এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে আনে এবং পুলিশ হেফাজতে তার মৃত্যু হয়। আরও অভিযোগ এই যে, ঐ ব্যক্তির স্ত্রী জারিনা অ্যাডাম তাঁর স্বামীর খোঁজে থানায় গেলে তাঁকে আটকে রেখে ধর্ষণ করা হয়। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানার ১০ জন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হয় এবং বোম্বে হাইকোর্ট অপরাধীদের ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর জন্য নিহত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীকে ১০ লক্ষ টাকা এবং তাঁকে ধর্ষণের জন্য দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে বোম্বে হাইকোর্ট মহারাষ্ট্র সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মহিলা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের সময় মহিলা পুলিশের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক এবং কোন অবস্থাতেই সূর্যাস্তের পরে ও সূর্যোদয়ের আগে কোন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা বা থানায় আটক রাখা আইনবিরুদ্ধ কাজ এবং এই প্রচলিত আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করার নির্দেশ দেয়। মহারাষ্ট্র সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন জানালে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, প্রয়োজনে এবং তদন্তের স্বার্থে মহিলা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনকে মেনে চলার কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। পুলিশ যে কোন সময়, এমনকি রাত্রেও মহিলা পুলিশের উপস্থিতি ব্যতিরেকে যে কোনও মহিলাকে গ্রেপ্তার করতে পারে বা থানায় আটকে রাখতে পারে।

"এই সভা বোম্বে হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানানোর সাথে সাথে সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। বিশেষ করে যেখানে সাম্প্রতিককালের কয়েকটি ঘটনা প্রমাণ করে দেয়, প্রশাসনের শৈথিল্য ও দুর্নীতির ফলে, সাধারণভাবে আইনশৃঙ্খলারও উদ্বেগজনক অবনতি ঘটেছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, আইনশৃঙ্খলার রক্ষকরাই আজ আইনের কোনও তোয়াক্কা না করে দুষ্কৃতিকারীর ভূমিকা নিচ্ছে।"

৩০ অক্টোবর কলকাতায় মেট্রো স্টেশনের সামনে পথসভায় বক্তব্য রাখছেন এম এস এস-এর সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী। সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা ছায়া মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদিকা সাধনা চৌধুরী ও লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক ভবেশ গাঙ্গুলি বক্তব্য রাখেন।

‘আইন মেনে আন্দোলন হলে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটত না’

(মিটি)-মিছিল নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের প্রতিবাদে ১০ অক্টোবর এস ইউ সি আই আয়োজিত নাগরিক কনভেনশনে প্রভাস ঘোষ, পার্থসারথি সেনগুপ্ত ও তরুণ সান্যালের বক্তব্য ইতিপূর্বে প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যান্যদের বক্তব্য এখানে প্রকাশ করা হল।ঃ

এই রায় কখনই গ্রহণযোগ্য নয়

অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল

আমাকে এই সভাতে বলতে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য আমি উদ্যোক্তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। যেসব কথা শুনলাম এবং যে প্রস্তাব পাঠ করা হল, আমি তাকে সমর্থন করছি।

আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যেসব কথা বলা হচ্ছে, তাতে আন্তরিকতা আছে বলে মনে হচ্ছে না। যেমন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু মাননীয় ব্যক্তি, তিনি বিচারপতি লালার রায়-এর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন — ‘গো ব্যাক লালা’, ‘লালা তুই পালা’। এ ধরনের কথা শুনে মনে হচ্ছে, রায়ের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে এঁদের কোনও আন্তরিকতা নেই।

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক মাননীয় অনিল বিশ্বাস মহাশয় বলেছেন, গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভ। একটি সরকার, দ্বিতীয়টি আদালত বা বিচারবিভাগ। আদালত গণতন্ত্রের স্তম্ভ এটা মানছি, কিন্তু সরকার গণতন্ত্রের স্তম্ভ, এটা মানছি না। কারণ মোদি সরকারকেও তাহলে গণতন্ত্রের স্তম্ভ মানতে হয়, পাকিস্তানের স্বৈরাচারী মোশারফ সরকারকেও গণতান্ত্রিক মানতে হয়। তা মানতে পারছি না। আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৬ হাজার প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারলেন না ভয়ভীতির জন্য। এ সরকার কি গণতন্ত্রের স্তম্ভ? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এস ইউ সি আই দলের মহিলা কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে। পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করতে পারে রাস্তা অবরোধ করার জন্য, তা নিয়ে আমার প্রশ্ন নেই। কিন্তু মেয়েদের নগ্ন করে রাস্তায় পেটাবে, তাদের শালীনতা নষ্ট করবে পুলিশ। একি একটি গণতান্ত্রিক সভ্য সরকার করতে পারে? এই যে বস্তি উচ্ছেদ করা হচ্ছে, সেই অসহায় মানুষরা কোথায় থাকবে, কী করবে, তার কোন দায়দায়িত্ব নেই সরকারের ?

একথা ঠিক, মানুষের যে আন্দোলন করার অধিকার, তা খর্ব করা হচ্ছে, কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিকারে আন্দোলন করা দরকার। মিটিং-মিছিলের যে ঐতিহ্য এতদিন ধরে কলকাতায় চলে আসছে, বিভিন্ন দেশে চলছে, সেই অধিকার যদি আদালত কেড়ে নেয়, তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আইন মেনে আন্দোলন হলে আজও ইরেজ থাকত

অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

আজকের সভার উদ্দেশ্য মহৎ, তাই এটা মহতী সভা। এর উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সভার আয়োজন করার জন্য এবং আমাকে কিছু বলতে দেওয়ার জন্য। আমি ২৪ বছর ধরে ছাত্রদের পড়িয়েছি। আইনসভার রচিত আইন, সংবিধান ও আদালতের নির্দেশ সবগুলিই আইন। সে অর্থে যতক্ষণ না অন্যরকম সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ততক্ষণ সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মিটিং-মিছিল করা যাবে না বলে আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে, সেটাও আইন। এই যে আইনের বিচার, এ কোত্থেকে আসে? এ আসে রাষ্ট্রের চরিত্রবৈশিষ্ট্য থেকে। যেমন যেমন রাষ্ট্রের চরিত্র বদলে যায়, তেমন তেমন আইন আদালত-বিচার ব্যবস্থার চরিত্র বদলে যায়। সামন্তী যুগে ক্রীতদাসরা পালিয়ে গেলে তাদের ধরে এনে চাবুক মারা থেকে ফাঁসি দেওয়া পর্যন্ত সবই ছিল আইনসম্মত। সামন্তীব্যবস্থা থেকে যখন ধনবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এল, সেই আব্রাহাম লিঙ্কনদের সময়ে ক্রীতদাস রাখাই বেআইনি হয়ে গেল। অর্থাৎ রাষ্ট্রের চরিত্র বদল হওয়ায় আইনও বদলে গেল। আমাদের দেশে ইংরেজ শাসকরা যাঁদের ফাঁসি দিয়েছিল অপরাধী বলে, দেশদ্রোহী বলে, দেশ যখন স্বাধীন হল অর্থাৎ রাষ্ট্রের চরিত্র বদল হয়ে গেল তখন তাঁদের দেশপ্রেমী শহীদের মর্যাদা দেওয়া হল। পশ্চিমবাংলার আইনসভার চারপাশে ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা, মাতঙ্গিনী হাজরা ও আরও অনেক বিপ্লবীদের মূর্তি আছে। কিন্তু রাষ্ট্রের চরিত্র কি বদলায় আইন মেনে? যেমন আমেরিকায় জর্জ ওয়াশিংটন, জেফারসনরা কি স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন আদালতের অনুমতি নিয়ে? ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, মহাত্মা গান্ধী, এঁরা কি নিজের নিজের আদর্শ অনুযায়ী আন্দোলন করেননি? যদি আইন মেনে আন্দোলন হত, এদেশে ইংরেজ থাকত। আইন মানলে রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ভিয়েতনাম বিপ্লব হতনা। আইন ভঙ্গ করেই স্পার্টাকাসের বিপ্লব থেকে ফরাসী বিপ্লব মনুষ্যত্বের বিজয় ঘোষণা করেছে। অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে, শোষণ-নিপীড়নের আইনের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ বন্ধ করে দেওয়ার আইনের বিরুদ্ধে এভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়াটা মনুষ্যত্বের ধর্ম।

আমি মাঝে মাঝে দেখি, ছোট ছোট মিছিল। আমি কোনও দলের নাম করতে চাইনা। ২৫/৩০ জন ডাণ্ডা নিয়ে ঝাণ্ডা নিয়ে হল্লা করতে করতে গোটা রাস্তা জুড়ে চলেছে এবং পিছনে সবকিছু আটকে আছে, কোন ব্যাপার নেই। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, আমরা মিছিল করতাম। মেডিক্যাল কলেজের সামনে এলেই আমাদের স্লোগান বন্ধ হয়ে যেত, কলেজ স্ট্রীট, হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে আবার স্লোগান শুরু হত। কারণ রোগীদের অসুবিধা হবে। আমরা তো অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, গরিব মানুষের পক্ষে। ফলে, যে অ্যাম্বুলেন্স আটকে আছে, বা যে মুটে শ্রমিক মাথায় বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে পার করে দেওয়া, হাসপাতালের সামনে স্লোগান না দেওয়া — এটা তো মিছিলকারীদের মহৎ বিপ্লবী কর্তব্য। বামপন্থী আন্দোলনে এসব নীতি আচরণ ছিল। তা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

সত্য-মিথ্যা জানিনা, তবে কাগজে পড়লাম, আদালতের অন্যায় নির্দেশের বিরুদ্ধে একসঙ্গে প্রতিবাদ করার জন্য এস ইউ সি আই নেতা প্রভাস ঘোষ অন্যসব বামপন্থী দলকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ঠিক কথাই তো, ইরাকের জন্য যদি একসঙ্গে হাঁটতে পারি, গুজরাটের জন্য যদি এক হতে পারি, তাহলে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর যখন আক্রমণ এসেছে, তখন কেন একসঙ্গে আসতে পারিনা? এখনও যদি একসাথে আন্দোলন করতে না পারি, তবে পরিণতি কি ভেবে দেখেছি? ১৯৬৪ সালে সি পি আই ভেঙে যাওয়ার পরবর্তীকালে সাহিত্যিক বন্ধু দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প মনে পড়ছে, এখানে অনেকেই হয়তো সেটি পড়েছেন। এখনও একসাথে আন্দোলনের শরিক হতে না পারলে, কী দাঁড়াবে, ঐ গল্পের শেষেই সেটা বলা হয়েছিল। একটি চরিত্র মারা গেছে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে। সেখানে দুই বন্ধু এসেছে। ওরা দু'জন পুরনো কমরেড, এখন দু'জন দুই দলে। চলে যাওয়ার সময় একজন অপরকে বলছে ‘বিদায়, চলি।’ অপরজন বলছে — ‘এসো, শ্মশানে দেখা হবে।’ এখনও যদি হাতে হাত ধরে দাঁড়ানো না যায়, তবে শ্মশানেই আমাদের দেখা হবে।”

রাজ্য সরকারই মিছিলবিরোধী মানসিকতা তৈরি করেছে

সি পি আই এম এল নেতা কার্তিক পাল

সি পি আই এম এল (লিবারেশন) নেতা কার্তিক পাল বলেন, আমরা আজ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে মিছিল করেই এই কনভেনশনে এসেছি। খুব আশ্চর্য লাগে, এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ২৬ বছর থাকার পর আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে, মিটিং-মিছিলের গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে কি না। ২৬ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার, আরও বিশেষভাবে বুদ্ধদেববাবু ক্রমাগত শ্রমিকদের আন্দোলনের অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের বিরুদ্ধে বলে গেছেন। ‘রাস্তা অবরোধ চলবে না’, ‘রেল রোকো চলবে না’ ইত্যাদি হুমকি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অধিকার কেড়েও নেওয়া হয়েছে। আগে এসপ্লানেড ইস্টে আমরা সকলেই মিটিং করতাম, সরকার তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

চারের পাতায় দেখুন

সর্বদলীয় বৈঠক বয়কট

গণআন্দোলনের অধিকার খর্ব করার সিদ্ধান্তের অংশীদার আমরা হতে পারিনা — প্রভাস ঘোষ

মিটিং-মিছিলের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ জারি করার উদ্দেশ্যে বামফ্রন্টের ডাকা ২৯ অক্টোবর সর্বদলীয় মিটিংয়ে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৮ অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন ঃ

“যেহেতু রাজ্য সরকার যে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে তার উদ্দেশ্য হল গণআন্দোলন, মিটিং-মিছিলের অধিকার খর্ব করা, তাই আমরা তার অংশীদার হতে পারি না। আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করব না।

“এর আগে গণআন্দোলন দমন করার জন্য রাজ্য সরকার বহু লাঠি-গুলি চালিয়েছে, বহু অত্যাচার করেছে, কিন্তু সেগুলির থেকেও এটি আরও ভয়ংকর আক্রমণ। কারণ এটি আন্দোলনের অধিকারকেই খর্ব করার জন্য আক্রমণ। কট্টর সাম্রাজ্যবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, ইতালি সর্বত্র লক্ষ লক্ষ লোকের মিটিং-মিছিল হয়। সেখানেও পথচারী আছে, যানবাহন আছে — বরং আমাদের থেকে বেশিই আছে। কিন্তু সেসব দেশের সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিতে সাহস করেনি।

“দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি এবং বিগ বিজনেস ম্যাগনেটরা দীর্ঘদিন ধরেই চাপ দিয়ে যাচ্ছিল বনধ্-ধর্মঘট, মিটিং-মিছিল বন্ধ করার জন্য। এদেশে সাধারণ মানুষের উপর পুঁজিপতিশ্রেণী এবং সরকারের আক্রমণ বাড়ছে। ছাঁটাই, লক-আউট, বেকারি বাড়ছে। খাজনা, কর, জিনিসপত্রের দাম, পরিবহণ-বিদ্যুৎ-হাসপাতালের চার্জ বাড়ছে। এই অবস্থায় যাতে এর বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ গড়ে উঠতে না পারে, তাই এই সিদ্ধান্ত। এ'কাজে তারা হাইকোর্টের রায়কে ব্যবহার করছে। এই রায়ের অনেক আগেই রাজ্য সরকার মিটিং-মিছিলের উপর নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। তখন আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম।

“ছুটির দিনে কি মুখ্যমন্ত্রী, অন্য মন্ত্রীরা বা রাজ্যপাল দপ্তরে থাকেন যে প্রতিবাদ মিছিল হবে ? তাছাড়া বহু সময় তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করতে হয়। যখন হঠাৎ কোন একটা দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ হয়, গুজরাটের মতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে, কোথাও সরকার লাঠি-গুলি চালায় বা শিশুমৃত্যু ঘটে, তখন কি পঞ্জিকা খুলে ছুটির দিন দেখতে হবে ? তাছাড়া কিছু বিশেষ ঐতিহাসিক দিন থাকে যেগুলি পালন করতে হয়।

“ছোট মিছিল কখনও গাড়ি আটকায় না। কিন্তু বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার, লক্ষাধিক লোকের মিছিল কখনো রাস্তার একপাশ দিয়ে চলতে পারে না। মিছিলের গতিবেগকে নিয়ন্ত্রণ করবে রেডলাইট, গ্রীনলাইট — এই প্রস্তাবও উদ্ভট। মানুষ জীবনের দাবিতে মিটিং-মিছিল করে, শখ করে নয়। মিছিলের স্লোগানে, পদক্ষেপে একটা বলিষ্ঠতা থাকে, চরিত্র থাকে, দৃপ্ত ভঙ্গিমা থাকে যা পথচারী সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। সেটাকেও আজ তারা নষ্ট করে দিতে চাইছে।

“আমাদের অভিজ্ঞতা, আমরা যখন মিটিং-মিছিল করি, তখন জনগণ সেগুলিকে তাদের নিজস্ব আন্দোলন হিসাবেই দেখে। যতটুকু অসুবিধা হয়, গণআন্দোলনের স্বার্থে তাকে তারা ত্যাগ হিসাবেই নেয়। আমরা জনস্বার্থে মার খেয়ে লাঠি-গুলি খেয়েও আন্দোলন করি, জনগণ আমাদের পাশে থাকে। তাছাড়া আমরা এও মনে করি, এই নিয়ন্ত্রণ একবার শুরু হলে এখানেই থেমে থাকবে না। আরও নিয়ন্ত্রণ, আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ — বাড়তেই থাকবে। তাই আমরা কোনোভাবেই এই চূড়ান্ত জনবিরোধী সিদ্ধান্তের অংশীদার হতে পারি না। আমরা সর্বদলীয় বৈঠকে গিয়ে এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারি না যে, ‘কারাগারের পরিসর আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের সুবিধা করে দেওয়া হোক’।

“আমরা সরকারের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলাম, এই মুহূর্তে রাজ্যের হাসপাতালগুলির যে চরম দুরবস্থা তা নিরসনে অভিজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সভা ডাকা হোক। সরকার তা না করে এই সিদ্ধান্ত নিল।

“আমরা জনস্বার্থে লড়াই করি। নিয়ন্ত্রণ যাই হোক, দমননীতি যাই হোক, আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।”

বিদ্যুত মাশুল কমাবার জন্য ছাঁটাইয়ের কোনও প্রয়োজন পড়েনা

১৯৯১ সালে নয়া আর্থিক নীতিচালু করার সময় থেকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎনীতিতে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। সেই পরিকল্পনাই পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' এর মধ্য দিয়ে। এই নয়া বিদ্যুৎ আইন আক্রমণ নামিয়ে এনেছে দু'দিক থেকে — একদিকে অস্বাভাবিকহারে মাশুলবৃদ্ধির বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া, অন্যদিকে ব্যাপকহারে শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই।

সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে বিদ্যুৎ শিল্পকে সম্পূর্ণ বেসরকারীকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎকে পণ্যে পরিণত করে লগ্নীকারীদের লুণ্ঠনের মাধ্যম হিসাবে পরিণত করা হচ্ছে। এই বাণিজ্যিক নীতিকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য একদিকে বলা হচ্ছে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দাম কমানো হবে, অন্যদিকে বলা হচ্ছে উৎপাদন খরচ নয় — সরবরাহ খরচই (cost of supply) হবে বিদ্যুতের দাম। এর ফলে মাশুল হু হু করে বাড়ছে। আবার বৃহৎ শিল্পের লগ্নীকারীদের কম দামে বিদ্যুৎ দেবার উদ্দেশ্যে অভিন্ন মাশুল নীতি চালু করার ব্যবস্থা হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে বিদ্যুৎ শিল্পে লগ্নীকারীদের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি, অন্যদিকে বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থার জন্য কম দামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করাই হল 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩'এর আসল উদ্দেশ্য।

'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' চালু হতেই শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর নেমে এসেছে আক্রমণ। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ভেঙে টুকরো টুকরো করার পরিকল্পনা চলছে, নেওয়া হয়েছে 'স্বেচ্ছাবসরে'র পরিকল্পনা। সি-ই-এস-সি ইতিমধ্যেই মূলাজোড় প্ল্যান্ট বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৪৫০০ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই এবং পদ বিলোপের। এসব করা হচ্ছে বিদ্যুৎশিল্পে প্রতিযোগিতা এবং মাশুল কমানোর রঙিন ফানুস উড়িয়ে।

একথা বুঝতে হবে যে, বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের যুগে খোলা বাজারের নীতির মধ্য দিয়ে সুস্থ প্রতিযোগিতা এবং মাশুল কমানো সম্ভব নয়। এসব জনসাধারণকে বোকা বানাবার অপচেষ্টা মাত্র। বিশ্বায়নের ১২/১৩ বছরে অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারত পর্যন্ত কোথায় কতটুকু সুস্থ প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে? কোথায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে? কোথায় মূল্যবৃদ্ধি কমেছে? কোথাও নয়। প্রতিযোগিতার নামে অর্থনীতিতে নেমে এসেছে চরম বিশৃঙ্খলা। চলছে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ও শ্রমিক ছাঁটাই, যা সৃষ্টি করছে গভীরতর সমস্যা।

তাই সি-ই-এস-সি'র পরিচালক-গোষ্ঠীর প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি শ্রমিক-কর্মচারীদের অসুস্থ করে তুলেছে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মাশুল কমাবার প্রতিশ্রুতি বানরের পিঠে ভাগের গল্প মনে করিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর পরিকল্পনা গ্রাহক ও শ্রমিক-কর্মচারী উভয়কে উদরস্থ করার পরিকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। মাশুল কমাবার জন্য শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই-এর প্রয়োজন কোথায়? মুলাজোড় প্ল্যান্ট বন্ধ করার দরকার কী?

সি-ই-এস-সি'র বণ্টন ও সঞ্চালনে ১% ক্ষতি কমালে ১৮-২০ কোটি টাকা সাশ্রয় হতে পারে। মুম্বাইতে বি-এস-ই-এস'র এই ক্ষতি ১১%, আর সি-ই-এস-সি'তে ২২%। যে কোন উন্নত দেশে এই ক্ষতির পরিমাণ ৫% মাত্র। বণ্টন ও সঞ্চালনে এই ক্ষতির পরিমাণ কমানোর বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই প্রশাসনের সদিচ্ছা এবং

সাতের পাতায় দেখুন

নাগরিক কনভেনশন

তিনের পাতার পর

অবরোধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তখন তো কোনও হাইকোর্টের রায় ছিলনা। এইসব সরকারি কথাবার্তা ও বিধিনিষেধের মধ্য দিয়েই একটা কথা চালু করে দেওয়া হয়েছে — মিছিল মিটিং-এ রাস্তা জ্যাম হয়, অতএব তা খারাপ।

তিনি বলেন, বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে একটা কনভেনশন করা হয়েছে, আর এখানে আর একটা কনভেনশন হচ্ছে। দুটো কনভেনশন দু'ভাবনা থেকে আসছে। ওদের কনভেনশন মিটিং-মিছিলে বিধিনিষেধ আরোপ করার পক্ষে, আজকের কনভেনশন কোন বিধিনিষেধ মানতে রাজি নয়। বামফ্রন্ট সরকারের বন্ধু শিল্পপতিরা এখন মিটিং-মিছিলে জনগণের অসুবিধা নিয়ে বহু কথা বলছেন, কিন্তু যখন জুটমিলে এক ম্যানেজার শ্রমিককে হত্যা করে, চা বাগানে পুলিশের গুলিতে ৪ জন শ্রমিক মারা যায়, ১৩ পার্টির মিছিলে মাধাই হালদার যখন শহীদ হয় তখন তো ওদের দেখা যায়নি।

আজ বিশ্বায়নের যুগে শুধু কলকাতা নয়, সারা বিশ্ব মিছিল নগরীতে পরিণত হয়েছে। মিছিলকারী হিসাবে কলকাতার ঐতিহ্যের মান যদি রাখতে হয়, তাহলে আরও অনেক প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন করতে হবে।

গাড়ির মিছিলও তাহলে নিষিদ্ধ করা হোক

প্রতিবাদী উদ্যোগের পক্ষে গৌতম সেন

এ রায়ের গভীরে যাওয়ার আগে একটা ছোট উদাহরণ দিই। আচ্ছা আমরা যত দল আছি, যত সংগঠন আছে, আমরা বছরে মিছিল কতদিন করি? বেশি বেশি করেও যদি ধরি, ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৮০টা বা ১০০টা মিছিল করি। তাতে লোকের অসুবিধা হয়। আমি মানি, হ্যাঁ অসুবিধা হয়। কিন্তু গাড়ির মিছিল রোজ আমার পথ আটকায়। এটা কিন্তু রোজ হয়। আমাকে কাজে যেতে ট্রেন ফেল করতে হয়, হাসপাতালে রুগি দেখতে যেতে দেরি হয়। তা বিচারক মশাই নিজে গাড়ি চড়েন। তিনি কেন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত নিজের গাড়ি সহ সমস্ত ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ করে দিচ্ছেন না? প্রয়োজন ছাড়া কোন গাড়ি চলবে না। আমরা সবাই সাধারণ যানবাহনে যাব। বিচারক থেকে মন্ত্রী, আমরা সবাই। এটা কেন হয় না? তার কারণ আমরা একটা কথা ভুলে যেতে বসেছিলাম যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচারপতিরা প্রত্যেকটি প্রশ্নে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থেই রায় দেবে। মিটিং-মিছিল সমস্যা একটা উপলক্ষ্য। এমনও হতে পারে, এই সামান্য উপলক্ষ্যে মিটিং-মিছিল বন্ধের যে রায় — এর আয়োজন-প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ছিল। এর আগেও কেরালা হাইকোর্ট রায় দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ধর্মঘট নিষিদ্ধ করেছে। অথচ আমরা যারা বামপন্থী শক্তি, তারা ধর্মঘটে-ধর্মঘটে সারা দেশ ছেয়ে দিতে পারলাম না। এ আমাদের লজ্জা। ভারতীয় সংবিধানে এই সুযোগ আছে যে, কোন বিচারক যদি তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কোনও রায় দেন, তবে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার পীঠস্থান হিসাবে পার্লামেন্ট সেই বিচারককে ডেকে ভর্ৎসনা করে বলতে পারে যে, এই অধিকার তোমার নেই। অথচ পার্লামেন্টে বামপন্থী দলগুলোর সদস্যরা সেরকম কোনও চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না। বরং এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তখন উপদেশ দিচ্ছেন — যেখানে সেখানে মিটিং-মিছিল নয়।

আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন — কাগজে রোজ দিচ্ছে জনমত সমীক্ষা। এমন একটা সমীক্ষা নিশ্চয়ই জোগাড় হয়েছে। ৮০ ভাগের ওপর মানুষ বলছে, তারা এই রায়ের পক্ষে। হতে পারে। কিন্তু আইন যেমন আমাদের প্রতিবাদের ধরন ঠিক করে দিতে পারেনা, জনমতও তা পারে না। কারণ, জনমত ঘুরে ঘুরে চলে। জনমতকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিভ্রান্ত করা যায়। জনমত দিয়ে সব ঠিক হয়না। এখানে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে। ১৯৮৪ সাল নাগাদ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন থ্যাচার। তিনি বললেন — কলকারখানায়, শিল্পে, খনিতে ধর্মঘট করার আগে ভোট নাও। ধর্মঘটের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকের সমর্থন যাচাই কর, তারপর ধর্মঘট করতে পারবে। ধর্মঘটের নেতা স্টারভিং বলেছিলেন, যারা ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে, আর যাঁরা ছাঁটাই হয়নি, উভয়পক্ষ একসঙ্গে সবসময় একই মত দিতে পারে না, আমরা ভোট নেবনা। ফলে জনমত সবসময় প্রতিবাদের ধরন ঠিক করে দিতে পারেনা। প্রতিবাদ বা আন্দোলন দিয়েও জনমত সংগঠিত করতে হয়। সেইজন্যই তো রবীন্দ্রনাথ সেই ডাক দিয়েছেন — 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।' ফলে জনমত-এর ভয় দেখিও না। আর যদি সত্যি জনমতের কথা বল, তবে আমি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছি। আমরা ভারতবর্ষের জনমত নেব যে, ধনীদের সমস্ত ফাঁকা বাড়ি দখল করে নেবে গরিবরা, জনমতে রাজি তো? আমরা ভারতবর্ষের জনমত নেব, ধনীর সব সম্পদ গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে। এ বিষয়ে জনমত নিতে তোমরা রাজি তো? আমরা জনমত নেব, যে খাবার গুদামে পচে যায় সেই খাবার দখল করে গরিবদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হবে। তোমরা রাজি তো? ফলে, জনমতের ভয় তোমরা দেখিও না। সুবিধা মত ওরা জনমতের প্রয়োজন দেখাবে, অন্য সময় জনমত মানবে না। আসলে জনমতের কথা তুলে ওরা জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। ওদের মিথ্যা যুক্তিগুলো বুঝতে হবে। ওরা বলছে, আরও পুঁজি বিনিয়োগ চাই, তাহলে উন্নতি হবে, বেকার সংখ্যা কমবে। আন্দোলন হলে এই পুঁজি চলে যাবে। কিন্তু দেশে যত বেশি পুঁজি বিনিয়োগ হবে, তত বেকার সংখ্যা কমবে — এমন কোন কথা পৃথিবীর কোন অর্থনীতিশাস্ত্র বলতে পারে না। পুঁজি বিনিয়োগ হলে কিছু লোকের চাকরি হতে পারে, না-ও হতে পারে। পুঁজির বিনিয়োগ হলে দারিদ্র্য কমবে, এমন কোন কথাও নেই। অর্থনীতির আরও নানা শর্তের উপর তা নির্ভরশীল। শুধু পুঁজি বিনিয়োগ হলেই মানুষের উন্নয়ন হবে, এটা মিথ্যা কথা।

ভারতবর্ষের জনগণ গণতন্ত্রের বিপদে নিজেকে জাহির করতে পারছে না। ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট মেরুদণ্ডহীন আচরণ করছে। আমরা সাধারণত সবসময় বলি — বিজেপি ফ্যাসিবাদ আনছে। শুধু বিজেপি ফ্যাসিবাদ আনছে না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ভেতর থেকেই ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান হয়। জনগণের ভোটের মাধ্যমেও ফ্যাসিবাদ আসে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ হচ্ছে। পার্লামেন্টকে অগ্রাহ্য করে আইনের নতুন নতুন ব্যাখ্যা হচ্ছে, নতুন নতুন আইন প্রণয়ন হচ্ছে, আইন ভঙ্গ করার চেষ্টা হচ্ছে।

একজন আইনজীবী বলেছেন — বিচারকের উপর ডিভিশন বেঞ্চ আছে, তার উপর সুপ্রিম কোর্ট আছে। ওনার বক্তব্যের সঙ্গে সংযোজন করছি, সুপ্রিম কোর্টের উপরে সুপ্রিম কোর্ট আছে, সে হচ্ছে জনগণের কোর্ট। ওরা ভয় দেখাচ্ছে, মিছিল-মিটিং হলে জেলে পুরে দেবে। সিয়াটলে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে, দুরন্ত দুর্দান্ত। ছুটির দিন দেখে হয়নি। ওদের মুখে স্লোগান ছিল — এ কার রাস্তা? এ আমাদের রাস্তা।

আমি সেই আশায় দিন গুনছি যে, পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এভাবে কোনদিন রাস্তা করে নেবে মিছিল করে। একটা দিনের জন্য কলকাতা সিয়াটল হয়ে উঠুক, কলকাতা জেনোয়া হয়ে উঠুক। দেখব ওরা কী করে ?

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া প্রতিরোধ করা যাবে না

শ্রমিকনেতা সরল দেব

সভা-সমাবেশ মিছিল করে প্রতিবাদ জানাবার অধিকার আমাদের সংবিধানেই আছে। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করা হয়েছে, যা আমরা হরণ করতে দিতে পারিনা। সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের প্রতিবাদ জানাতে কিছুদিন আগে আমরা, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি দিল্লিতে এক যুক্ত কনভেনশনে মিলিত হয়েছিলাম। সংবিধান অনুযায়ী কর্মচারীদের ছাঁটাইয়ের অধিকার সরকারের আছে, কিন্তু কোথাও ধর্মঘট বেআইনি বলা হয়নি। অথচ আদালত সেই রায় দিয়ে দিল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিও সুয়োমোটো রায় দিয়ে দিলেন, মিটিং-মিছিল করা যাবে না। চটকল মালিকরা যখন খেয়ালখুশিমত লকআউট করে দিয়ে শ্রমিকদের পথে বসায়, শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা চুরি করে, তখন তো বিচারপতিদের সরব হতে দেখি না। গোটা বিচারব্যবস্থার মধ্য দিয়েই বিশ্বায়নের প্রভাবের প্রতিফলন ঘটছে। ফলে কোনও রায়ই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

আজ সারা দেশজুড়েই শ্রমিক-কর্মচারী সাধারণ মানুষের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ। একে প্রতিহত করতে হলে, বামপন্থী আদর্শে যারা বিশ্বাসী তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দুঃখের কথা, দেশে বামপন্থীরা আজও শতধা বিভক্ত। একদিন এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করতে গিয়ে ছাত্রযুবকরা যেমন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিল, আজ তেমন করে সকলকে সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে, ঐক্যবদ্ধ ভাবে জনবিরোধী নীতিগুলির প্রতিরোধে দাঁড়াতে হবে। আমি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানিয়েই বক্তব্য শেষ করছি।

এছাড়াও বলশেভিক পার্টি, এন সি পি আই, সি আর পি আই, ওয়ার্কাস পার্টি, এ আই সি সি টি ইউ-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়।

ইরাকের সংগ্রামী জনগণের প্রতি সংহতি জানাতে

সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন সফল করুন

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিবিপ্লবের পথে পুঁজিবাদের ফিরে আসার এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদীরা ঘোষণা করেছিল সমাজতন্ত্রের বিপদ দূর হয়েছে, ঠাণ্ডা যুদ্ধও শেষ — অতএব বিশ্বে এখন আর যুদ্ধের সম্ভাবনাও রইল না। শুরু হল শান্তির যুগ। দু'দশকের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে বিশ্বের দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসরদের আগ্রাসী আক্রমণ, মধ্য এশিয়ার নানা দেশে বিশেষ করে প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা খর্ব করে সেদেশের জমি দখল করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষ্ট জিয়োনিস্ট ইজরায়েলের বর্বর নিরবচ্ছিন্ন সামরিক অভিযান ও গণহত্যা প্রমাণ করেছে — পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকলে যুদ্ধ শেষ হয় না। দুনিয়ার কোটি কোটি শান্তিপ্রিয় মানুষ নিশ্চিন্ত জীবনের স্বাদ পেতে পারে না।

সোমালিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আফগানিস্তান হয়ে এমন এক আক্রমণের শেষ নিদর্শন হল ইরাক। ইরাক যুদ্ধে এ বছর ৮ এপ্রিল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোটের দানবীয় বীভৎস হানাদারিতে বিপর্যস্ত হয়ে যেদিন বাগদাদের পতন ঘটে, সেদিন অনেকে বিহ্বল-বিভ্রান্ত হয়ে ভেবেছিলেন — মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ শুধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়, অপ্রতিরোধ্য। বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের আজ তাদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করা ছাড়া পথ নেই। কিন্তু আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেছিল —'বাগদাদের পতনে ইরাক যুদ্ধ শেষ হল না, শুরু হল দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাপ্রিয় নির্ভীক ইরাকি জনগণের ইঙ্গ-মার্কিন দখলদারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম।' সেই প্রতিরোধ সংগ্রাম উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে সার্বভৌমত্ব হারানো ইরাকি জনগণের মরণপণ সংগ্রাম স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। তার সামনে মার্কিন সমরচক্র এখন ভীত চিন্তিত। মার্কিন সেনাদের ইরাক বাসের মেয়াদ বাড়ছে। অবাঞ্ছিত দখলদার হিসাবে তারা ঘৃণার পাত্র। প্রতিদিন আত্মঘাতী আক্রমণের মুখে তাদের পড়তে হচ্ছে। হতাশায় মার্কিন সেনারা আত্মহননে রত। ইরাকের মাটিতে দাঁড়িয়ে শুধু মার্কিন তাঁবেদার ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যরাই নয়, খোদ পেন্টাগনের কর্তারাও আতঙ্কে কাঁপছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আবার জেগে উঠছে স্লোগান ঃ বুশ-ব্লেয়ার জোট ইরাক থেকে হাত ওঠাও।

এমনই এক পটভূমিতে সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরাম তাদের আসন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশনের মাধ্যমে আবারও বিশেষ জোর দিয়ে জানাতে চাইছে বীর ইরাকি জনগণের সংগ্রামের প্রতি ভারত তথা দুনিয়ার শান্তিপ্রিয় সংগ্রামী মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন। বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চাইছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত আন্দোলনের অঙ্গীকার। আমরা এদেশের মানুষকে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৯৫ সালে এই ফোরামের প্রথম আন্তর্জাতিক কনভেনশনের বক্তব্য — সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্যবাদকে যতই অপ্রতিরোধ্য মনে হোক না কেন, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ কখনও শেষ কথা বলতে পারে না। শান্তিকামী স্বাধীনতাপ্রিয় কোটি কোটি মানুষ কোনদিন সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা, তার আগ্রাসনকে মেনে নেবে না, গড়ে তুলবে অমোঘ প্রতিরোধ। আজ ইরাকিদের প্রতিরোধ, বিশ্বজোড়া প্রতিবাদ সেই কথাকেই নতুন করে প্রমাণ করে লিখতে চলেছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের নতুন অধ্যায়। এই আন্দোলনের শরিক হিসাবে আমরা বলতে চাই এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে দুর্বার জঙ্গি শান্তি আন্দোলনে উন্নীত করতে হবে। সঠিক রাজনীতি, সংগঠিত নেতৃত্ব আর সংগ্রামী মেহনতী মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে অবলম্বন করে সেই শান্তি আন্দোলন যেদিন দেশে দেশে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে রূপ নেবে — সেদিনই তৈরি হবে পৃথিবী থেকে যুদ্ধাতঙ্ক শুধু দূর হওয়াই নয়, মানুষের দ্বারা মানুষের অত্যাচার-অনাচার-শোষণ থেকে মুক্তির সম্ভাবনা। ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল দিনগুলোতে সংগ্রামী মানুষ গর্বের সাথে ফিরে তাকাবে বীর ইরাকি জনগণের আত্মত্যাগের দিকে।

সেই সাথে আমাদের বুঝতে হবে যে, পথ আমাদের আদপেই ফুলে ঢাকা নয়। আধুনিক সংশোধনবাদের কৃপায় আজ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক শিবিরহীন দুনিয়া পেয়ে গিয়েছে, মুক্ত বাণিজ্য-বিশ্বায়ন-উদারীকরণের নামে সেই দুনিয়াটার ওপর বিশেষ করে বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল দেশগুলির ওপর তাদের শোষণকে আরও তীব্র করার চেষ্টা করে চলেছে। সামরিক শক্তির দম্ভে ক্ষমতান্ধ যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অদূর ভবিষ্যতেও হয়ত নতুন নতুন আগ্রাসন-আক্রমণ চালাবে ; আজ এ দেশ, কাল সেদেশের ওপর তাদের আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ করার লক্ষ্য থেকে। এ নীতি, এই কার্যক্রম শুধু একজন জর্জ বুশ বা ধামাধরা একটা ব্লেয়ারের নয়। এ হল মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি। আজ তারা এমন এক অনিরসনীয় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক, এক কথায় সর্বাত্মক সংকটের পাঁকে ডুবে রয়েছে — যা থেকে তারা চিরতরে মুক্তি পাবে সর্বহারাশ্রেণীর হাতে একমাত্র তাদের বিনাশে।

তবু টিকে থাকার মরিয়া প্রচেষ্টায় বাজার অর্থনীতির তীব্র বাজার সংকট আর অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক মন্দাকে কাটাতে দেশে দেশে পুঁজিপতিশ্রেণী গড়ে তুলেছে মিলিটারি-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স। আজ তাই ছোট-বড় সব পুঁজিবাদী দেশেই অর্থনীতির সামরিকীকরণ চূড়ান্ত, প্রতিটি দেশের বাজেটের সিংহভাগই ব্যয় হয় যুদ্ধাস্ত্র তৈরি বা কেনার খাতে, প্রতিরক্ষার নামে। আর যুদ্ধসরঞ্জাম ও মারণাস্ত্রের এই কেনাবেচার ব্যবসার মধ্য দিয়ে তারা সরকারি তহবিলের অর্থাৎ জনগণের টাকা খরচ করে কৃত্রিম উপায়ে বাজারকে চাঙ্গা করে তোলে। তাই যখনই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার অর্থনীতির মন্দা, দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারি, আর তার ফলে তীব্র জনবিক্ষোভের মুখে পড়ে, তখনই বাজিয়ে তোলে রণদামামা — কখনও সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে, কখনও গণহত্যার মারণাস্ত্র খোঁজার অছিলায়। অথচ আফগানিস্তানের মতো বিশ্বের দেশে দেশে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই মদত দিয়ে গড়ে তোলে, কসোভো-যুগোশ্লাভিয়া-সোমালিয়ার মতো নানা দেশে বিভেদকামী শক্তিকে সেই সৃষ্টি করে, মদত যোগায়। মারণাস্ত্রের সবচেয়ে মারাত্মক আর বিরাট সম্ভার আজ তাদেরই হাতে। তাই সন্ত্রাসবাদ দমন, অপর দেশের হাতের গণবিধ্বংসী অস্ত্র উদ্ধার — এগুলো তাদের অছিলা। যুদ্ধ আজ তাদের কাছে মৃতসঞ্জীবনীর মতো — যুদ্ধাস্ত্রের যত ব্যাপক প্রয়োগ হবে, তত তার ধুঁকতে থাকা মিলিটারি-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স মুনাফায় পুষ্ট হয়ে নতুন বল পাবে। তাই দেখা যায় যুগোশ্লাভিয়ায় যুদ্ধ শেষ হতে আফগানিস্তান, তার পিঠোপিঠি ইরাক। আবার ইরাক যুদ্ধে নামতে নামতেই ইরাক-ইরান-উত্তর কোরিয়াকে 'শয়তানের অক্ষ' নাম দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চিহ্নিত করেছে। এর যেকোন একটির ওপর সে তার নখ-দাঁত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। সাম্রাজ্যবাদের বর্বর আক্রমণের শিকার যেই হোক, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে আজ এ সত্য বুঝে নিতে হবে — শেষ বিজয়ের লড়াই গড়ে তুলতে আমরা যত দেরি করে ফেলব — তত আমাদের ওপর সাম্রাজ্যবাদীদের এই আগ্রাসন-অত্যাচার-গণহত্যার বর্বরতা চলতেই থাকবে।

ফলে একই সাথে আমাদের বুঝতে হবে আর এক দায়িত্বের কথা। আজ যদি আমরা যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনটাকেই শুধু দেখি, তাই দেখে যদি মনে করি তারা আজ অপ্রতিরোধ্য — তাহলে বুঝতে হবে ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারিনি।

আজ বাস্তব আমাদের সামনে কী তুলে ধরেছে ? সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের ফলে অবশ্যই কিছুটা সুবিধা পেয়েছিল যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দেশের পর দেশে আক্রমণ চালালেও, সমাজতান্ত্রিক শিবির তার উপস্থিতি দিয়ে ও তার সুবাদে তদানীন্তন বিশ্বের সদ্যস্বাধীন পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশগুলিকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সমর্থন জুগিয়ে জোরদার করে তুলেছিল শক্তিশালী শান্তি-আন্দোলনকে। তাই একদিন কোণঠাসা সাম্রাজ্যবাদীরা ঠাণ্ডা যুদ্ধের দোহাই দিয়ে বিশ্বের মানুষকে বোঝাতে চাইত — সমাজতন্ত্রই গণতন্ত্র ও বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপদ। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পর গত এক দশকই প্রমাণ করেছে কত বড় মিথ্যা ছিল এই প্রচার। তারা বলেছিল — সমাজতন্ত্র ধ্বংস হলে বিশ্বে শান্তির স্বর্গ গড়ে উঠবে, দেশে দেশে অর্থনীতির জাতীয় বেড়াজাল ভেঙে গিয়ে সৃষ্টি হবে সমৃদ্ধ গ্লোবাল ভিলেজ। তাদের এ প্রচারের বেলুন দুদিনে চুপসে গিয়েছে বাস্তবের চাপে। কারণ বাস্তব হল, বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আজ তীব্র বাজার সংকটে থরথর করে কাঁপছে। তাই চুক্তি করে বিশ্বের বাজারকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করার যত চেষ্টাই সে করুক না কেন, বাজার দখলের উদগ্র প্রয়াসে দু'দিনেই চুক্তির কালি ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। ক্রমাগত বেড়ে উঠেছে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বা তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। ইরাক যুদ্ধের প্রাক্কালে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ফ্রান্স-জার্মানি-রুশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধ এই দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ। তেলের বিশ্ববাজারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে তারা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ঠেকাতে চেয়েছিল। তাই গোটা পৃথিবী জুড়ে উত্তাল যুদ্ধবিরোধী জনমতকে অগ্রাহ্য করে, এমনকি রাষ্ট্রসংঘের অস্ত্রপরীক্ষকরা ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র নেই — এই মর্মে রিপোর্ট দেওয়া সত্ত্বেও, যখন ইঙ্গ-মার্কিন জোট নিরাপত্তা পরিষদকে তাদের কুকর্মের রাবার স্ট্যাম্প করতে চাইল — তখন ফ্রান্স-জার্মানি-রাশিয়ার শাসকরা বাধা দিয়েছিল। একথা ঠিক যে শেষপর্যন্ত বেপরোয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন বিশ্বজনমত তথা সমস্ত আন্তর্জাতিক রীতিনীতিকে পায়ে মাড়িয়ে ইরাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কোন সক্রিয় বাধা ছিল না। কিন্তু তার দ্বারা তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব উবে যায়নি, আজ আবার তা ফুটে উঠতে চলেছে। যুদ্ধজয় করেও ইরাক আজ মার্কিনী শাসকদের গলার কাঁটা। অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে এই যুদ্ধ — অথচ যুদ্ধের খরচ তথা পুনর্গঠনের নামে ইরাককে কব্জায় রাখার জন্য সেদেশে বিপুলসংখ্যক মার্কিন সেনা মোতায়েনের বিশাল খরচ আজ মার্কিন সরকারি তহবিলের ওপর বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য মার্কিন জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়ছে। তার ওপর দীর্ঘ কষ্টকর জীবনের ক্লান্তিতে, সর্বোপরি স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী ইরাকিদের প্রত্যাঘাতে সেখানকার মার্কিন সেনাদের মনোবল তলানিতে এসে ঠেকেছে। রোজ বডি ব্যাগে মার্কিন সেনাদের লাশ আর বিমানভর্তি আহত সৈনিককে ঘরে ফিরতে দেখে মার্কিন জনগণও আজ আবার যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার, শাসকদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইরাকি প্রতিরোধে তটস্থ মার্কিন সেনা

১ নভেম্বর দেশপ্রেমিক গেরিলাদের প্রতিরোধে ভূপাতিত মার্কিন যুদ্ধকপ্টারকে ঘিরে মার্কিন সেনা

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন

পাঁচের পাতার পর

বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। এমনকি ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম কুশীলব যে বিরোধীপক্ষ শাসকদলের সঙ্গে একজোট হয়ে যুদ্ধের পক্ষে একদিন সম্মতি দিয়েছিল, আজ তারাও প্রশ্ন তুলছে। রামস্‌ফেল্ডের মতো বিবেকহীন সামরিক কর্তাও সন্দেহ প্রকাশ করছেন — তাঁদের তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদবিরোধী' অভিযান কতটা সফল। ঘরে-বাইরে এ হেন তটস্থ অবস্থায় মার্কিন শাসকরা আবার রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তাদের সর্বশেষ প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করছে যুদ্ধের ব্যয়ভার, ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানিকে অন্য দেশগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে। নানা কারণে রাষ্ট্রসংঘে সে প্রস্তাবকে সমর্থন করেও ফ্রান্স-জার্মানি-রাশিয়ার মতো শক্তি যে অর্থ বা সৈন্য কোনও কিছু দিয়েই সাহায্য করছে না — মার্কিনীরাও আজ সে কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ বাজার দখলের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের দ্বন্দ্ব নানা ঘাতপ্রতিঘাতে নানা মোড় নিলেও দূর হওয়ার নয়, বরং সংকট যত বাড়বে, এ দ্বন্দ্বও তত বাড়বে। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বাইরে আবার অজস্র ছোট-বড় পুঁজিবাদী দেশ রয়েছে। বিশ্বায়নের ধুয়োর আড়ালে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক শোষণের থাবায়, আবার ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা তার সমর্থনপুষ্ট ইজরায়েলের মতো দেশের সামরিক শক্তির দাপটে নিষ্পেষিত হলেও, তাদের নিজেদের দেশের সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ছে বৃহৎ দেশগুলির সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব। তাই কখনও ডব্লু টি ও-র বৈঠকে, কখনও বা পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সমাবেশে ফেটে পড়ছে — বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এদের তীব্র বিক্ষোভ, যদিও এরাও সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শিবিরেরই অংশ। তাই এই দ্বন্দ্বের পাশাপাশি আছে বোঝাপড়া ও আপস। এদের মধ্যে আবার রয়েছে ভারতের মতো পুঁজিবাদী দেশ, যেখানে সুসংহত পুঁজিবাদ বৃহৎ দেশগুলির তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও শুধু একচেটিয়া পুঁজিরই জন্ম দেয়নি, সেই সাথে এশিয়া-আফ্রিকার দুর্বলতর পুঁজিবাদী দেশে লগ্নী পুঁজি রপ্তানি করে সে সব দেশের কাঁচামাল আর শ্রমশক্তিকে শোষণ করে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের এক ছোট হিস্যাদারে পরিণত হয়েছে। তারাও আজ তাদের দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের চূড়ান্ত সংকটের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে চেষ্টা করে চলেছে বিশ্ববাজারে জায়গা করে নিতে। তাই বিশ্বায়নকে তারা উদ্বাহু হয়ে স্বাগত জানিয়েছে, বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নানা গাঁটছড়া বেঁধে সুবিধা আদায়ের অর্থাৎ বিশ্ব বাজারের ভাগ পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। আর এই বাজার দখলের লক্ষ্যেই মাঝে মাঝেই তার সাথে দ্বন্দ্ব লেগে যাচ্ছে বৃহৎ দেশগুলির। আবার দেশের মধ্যে বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, চূড়ান্ত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক নৈরাজ্যের ধাক্কায় জনগণের বিক্ষোভ ক্রমাগত বেড়ে চলায় এসব দেশের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী বা সরকারি ক্ষমতায় থেকে তাদের স্বার্থরক্ষা করে চলে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বা শক্তি তারা অনেক সময়েই বাধ্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করায়। ভারতের মতো দেশে যেখানে জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার এক দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, সেখানে তাই কেন্দ্রীয় সরকারি শাসনক্ষমতায় আসীন চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী, সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি 'সন্ত্রাসবাদ' দমনের নামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মেলালেও, এমনকি আমেরিকা বা তার দোসর ইজরায়েলের মতো বর্বর অত্যাচারী শক্তিকে গণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে ভারত-মার্কিন-ইজরায়েল ত্রিশক্তির ঐক্য গড়ার কথা বললেও, বা ইরাক যুদ্ধকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা না করলেও, মার্কিন শাসকদের চাপ-অনুরোধ সত্ত্বেও ইরাকে সৈন্য পাঠাতে পারছে না দেশের মধ্যে গণবিক্ষোভের ভয়ে। আবার সৈন্য না পাঠানোয় মার্কিন অসন্তোষকে স্তিমিত করতে, এই বিজেপি সরকারই মার্কিন একচেটিয়া সংস্থা বোয়িং কর্পোরেশনকে ৪০০ কোটি ডলারের বিমানের অর্ডার পাইয়ে দিয়েছে। অথচ সকলেই জানেন যে এই বোয়িং বিমানের দিন ফুরিয়ে এসেছে। অর্থাৎ একই সাথে বিরোধিতা, পরমুহূর্তে সমঝোতা — এই টানাপোড়েনগুলি আজ ভারত ও তার মতো ছোট-বড় পুঁজিবাদী দেশের সাথে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সমঝোতার মধ্যে দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন। এ প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় বোঝা দরকার। ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজ রাজনীতি কেবল বুশ-ব্লেয়ারের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সেসব দেশের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীরই নীতি। তাই ডেমোক্র্যাট ক্লিন্টন যেমন যুগোশ্লাভিয়াকে বোমা মেরে ছারখার করে দেয়, তেমনই বুশ ধ্বংস করে ইরাককে। তেমনই ভারতের মতো দেশেও মার্কিন ঘেঁষা নীতি বা কখন কখন ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা বিরোধী সুর — শুধু বিজেপির মতো শাসকদলেরই নীতি নয়; বুর্জোয়া-গণতন্ত্রে সরকারি ক্ষমতা অর্জনের দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বী অতি দক্ষিণ, দক্ষিণ, এমনকি বামপন্থার নামাবলী গায়ে দেওয়া দলগুলিও আজ শাসকশ্রেণীকে খুশি রেখে ক্ষমতায় টিকে থাকার বা ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টায় একই নীতিতে কাজ করে চলছে। তাই ইরাক প্রশ্নে বিজেপি-কংগ্রেসের সঙ্গে ঘুরপথে সি পি এমের একমত হতে অসুবিধা হয় না। রাজ্যের সীমিত ক্ষমতায় থেকেও 'সন্ত্রাসবাদ' দমনের নামে বিজেপি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে একান্ত বৈঠক করতে সি পি এম মুখ্যমন্ত্রীর বাধে না।

আজকের জটিল বাস্তবতায় এ সমস্ত উপাদানই, সব দ্বন্দ্বই কাজ করে চলেছে। যারাই সাম্রাজ্যবাদের নারকীয় গণহত্যাকারী ভূমিকার মনেপ্রাণে বিরোধিতা করবেন, তাঁদের এগুলি না বুঝলে চলবে না। আর এরই সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে, আর এক জীবন্ত বাস্তবতাকে। হাজার চেষ্টা করেও বিশ্বায়ন-উদারীকরণের দাওয়াই বাতলেও, নৃশংস আগ্রাসনের মাধ্যমে বাজার দখলের জন্য বা সংকটগ্রস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য যুদ্ধ চালিয়েও সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সংকট কাটিয়ে উঠতে পারছে না। উল্টে এই সংকট ডেকে আনছে তাদের আরও গভীর বিপদ — আরও ঘনীভূত করছে সংকটকে। দেশে দেশে আজ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে বিশ্বায়ন-উদারীকরণ-ডব্লু টি ও'র বিরুদ্ধে মেহনতী জনসাধারণের বিক্ষোভ, যে বিক্ষোভ শুধুমাত্র বেকারি-মূল্যবৃদ্ধি-পেনশন প্রথা লোপ ইত্যাদির বিরোধিতার মধ্যে থেমে থাকছে না ; ছোট-বড় সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে, এমনকি আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড-জার্মানি-ফ্রান্সেও বিশাল বিশাল প্রতিবাদ মিছিলে ধ্বনি উঠছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ করার, ইরাক থেকে হাত ওঠানোর। সে আওয়াজকে অস্বীকার করার উপায় কোন দেশের শাসকশ্রেণীর থাকছে না — তাই ভারতের শাসকদের সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে সৈন্য না পাঠানোর, জার্মানি-ফ্রান্স-রাশিয়ার শাসকদের নামতে হচ্ছে মার্কিন বিরোধিতায়, এমনকি মার্কিন শাসকদের হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে ইরাকের ওপর মার্কিন কব্জা বজায় রেখেও কিভাবে অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজের দেশের জনগণকে ঠকানো যায়। তাই বহু জটিল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আজকের আন্তর্জাতিক বাস্তবতা, দেশের পরিস্থিতি নতুন করে তুলে ধরছে ইতিহাসের সেই অমোঘ শিক্ষা — মেহনতী মানুষই সভ্যতা গড়েছে, ইতিহাস গড়েছে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা, রক্তচক্ষু, প্রলোভন, অবক্ষয়কে পরাস্ত করে জনগণের সেই দুর্বার শক্তি আবার মাথা তুলবে। নতুন ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদ গড়বে না, গড়বে জনগণের সংগঠিত শক্তি।

তাই সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের আসন্ন কনভেনশনে গর্জে উঠুক আওয়াজ ঃ দেশপ্রেমিক বীর ইরাকি জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম জিন্দাবাদ ! মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক থেকে হাত ওঠাও ! জিয়োনিস্ট ইজরায়েল প্যালেস্টাইন সহ মধ্য এশিয়ায় আগ্রাসন বন্ধ কর ! আওয়াজ উঠুক ঃ বিশ্বের দিকে দিকে নিপীড়িত অত্যাচারিত মানুষের তীব্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে জঙ্গি শান্তি আন্দোলনে উন্নীত করা হোক। সঠিক বিপ্লবী রাজনীতি আর সংগঠিত বিপ্লবী নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করে সমস্ত শান্তিকামী, গণতন্ত্রপ্রিয় শক্তি ও মানুষের লৌহদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলে জঙ্গি শান্তি আন্দোলন রূপ নিক দেশে দেশে শোষণমুক্তির, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের।

কমরেড গণপতরাম-এর জীবনাবসান

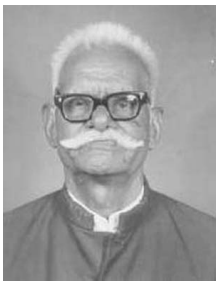

হরিয়ানা রাজ্যের এস ইউ সি আই ভিওয়ানি জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড গণপতরাম গত ২১ সেপ্টেম্বর, ৮৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি সারা ভারত কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের রাজ্য কাউন্সিলেরও সদস্য ছিলেন। এ যুগের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে কমরেড গণপতরাম ১৯৭৪ সালে দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। ঐ সময় ভিওয়ানি জেলায় দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম সবে শুরু হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর শাসনে কালা জরুরি অবস্থার সময়ে তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু কারাবাস তাঁর মনোবল ভাঙতে পারেনি। তিনি শ্রেণীসংগ্রামে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন এবং কৃষিমজুর ও মেহনতি কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেই ছিল তাঁর আস্থা। তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করতেন সর্বপ্রকার শোষণ, সামাজিক নিপীড়ন ও অবিচারের অবসান একমাত্র সমাজতন্ত্রেই সম্ভব, যেটা শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের বিপ্লবের পথেই অর্জন করা যাবে। বিপ্লবের স্বার্থরক্ষায় তিনি আজীবন একনিষ্ঠ ছিলেন। সকল কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি পার্টির প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা বাড়াতেই সাহায্য করেছেন। পার্টির প্রতিকর্তব্য ও দায়িত্ববোধকে তিনি আজীবন অন্য সবকিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও এর অন্যথা হয়নি। তাঁর কোমরের হাড় ভেঙে যাওয়ার পর যখন তিনি ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়েন, তখনও সাংগঠনিক চিন্তাভাবনাই তাঁর মন জুড়ে ছিল, কমরেডদের সাথে নিয়মিত অভিজ্ঞতার বিনিময়ও তিনি করতেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী তিনি পরিবারের প্রিয়জনদেরও দলের সাথে যুক্ত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। ২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এক স্মরণসভায় এস ইউ সি আই ভিওয়ানি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতির প্রতি বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

কমরেড উৎপল বাগচির জীবনাবসান

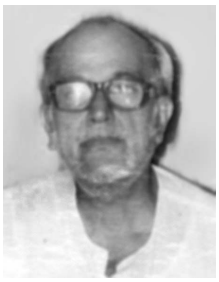

২৪ অক্টোবর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বর্ধমান জেলার এস ইউ সি আই গোপাল মাঠ লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড উৎপল বাগচি (৭২) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমৃত্যু দলের কর্মী কমরেড বাগচি ১৯৬০ সালে বিহারের পাথরডিতে রেলওয়ে ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের যৌথ আন্দোলনে (১১ থেকে ১৭ জুলাই লাগাতার ধর্মঘটে সক্রিয় ভূমিকা নেন) অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ যুগের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী দার্শনিক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এবং এস ইউ সি আই দলের প্রতি আকৃষ্ট হন। একজন রেল কর্মচারী হিসাবে তিনি রেলশ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৭০ সালে বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অণ্ডালে বদলি হয়ে এসে এখানেও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে এবং রেল কর্মচারী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ১৯৭৪ সালের ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। ঐ সময় তিনি গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান এবং চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। পরে চাকরি ফিরে পান। সাংগঠনিক দায়িত্ব তিনি সর্বদা একনিষ্ঠভাবে পালন করেছেন। হৃদরোগের আক্রমণ, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও বয়সের ভার সত্ত্বেও অণ্ডালের বিস্তীর্ণ এলাকার স্কুলে স্কুলে ঘুরে বৃত্তি পরীক্ষা সংগঠিত করা, বিদ্যুৎ বিল বয়কট, বনধ্-এর সমর্থনে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা, বুলেটিন বিক্রি ইত্যাদি শ্রমসাধ্য কাজে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা এলাকার ছাত্র-যুব কর্মীদের উজ্জীবিত করত। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র দলের জেলা কমিটির ও আঞ্চলিক কমিটির সদস্য এবং কর্মীরা ব্যথিত হৃদয়ে ছুটে যান। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য সম্পাদকের পক্ষ থেকে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুনীল পুরকায়েত, জেলা কমিটির পক্ষে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ভাস্কর রায়চৌধুরী ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

কমরেড উৎপল বাগচি লাল সেলাম।

সূর্যবাবুর আমলে নাকি স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে !

বুদ্ধদেববাবু বলেছেন — ''সূর্য আমার মন্ত্রীসভার সম্পদ''। এহেন সম্পদ মানুষটি বুক ঠুকে বলেছেন — ''আমার আমলে হাসপাতালে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে।'' প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেছেন — তিনি মন্ত্রী হওয়ার পর কয়েক বছরে সরকারি হাসপাতালে ইনডোর আউটডোর দুয়েই রোগী ভর্তি বেড়েছে। হাসপাতালে প্রসব, অপারেশন, আলট্রাসোনো পরীক্ষার সংখ্যাও বেড়েছে। একেবারে সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে তিনি কথাগুলি বলেছেন। (দ্রঃ বর্তমান, ৩১.১০.০৩)। তবে তিনি যা বলেননি তা হল, গত দশ বছরে সরকারি হাসপাতালে একটিও বেড বাড়েনি বরং কমেছে। ৯২ সালে সরকারি হাসপাতালে বেড ছিল ৫৭৮৭৫টি। দশ বছর পরে তা হয়েছে ৫৭০২২টি। এও খাতা কলমের হিসাব। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৫২৮৪টি বেডের কথা বলা হলেও বেশিরভাগ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই ভর্তির ব্যবস্থা নেই। হাসপাতাল বা বেড বাড়ছে না; কয়েক হাজার ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীর পদ খালি, সরকার নিয়োগ করছে না, অথচ স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ফল কি দাঁড়াচ্ছে? না, এ প্রশ্নে তিনি ঢোকেননি।

হাসপাতালে মরছে কত? নেহাত কপালজোরে বেঁচে ফিরছে কত? কত বাড়তি চার্জ আদায় হয়েছে, বেড না পেয়ে বা অর্থাভাবে ভর্তি করতে না পেরে হাসপাতালের দরজা থেকে ফিরে গিয়েছেন কতজন? এখানেও তিনি নিরুত্তর। বোবার শত্রু নেই।

সরকারি হাসপাতালে মানুষ মরলে তা খবর হয়না। খবর হলে জানা যায় মানুষ মরেছে। হাসপাতাল বেসরকারীকরণের পক্ষে জনমত টানতে মালিকগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমগুলো হাসপাতালে অবহেলা ও মৃত্যুর খবর দিচ্ছে। সংবাদে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তাতে বেরিয়ে এসেছে হাসপাতালের নরকতুল্য অবস্থার চেহারা। খতিয়ানটি এইরকম।

১ অক্টোঃ কলকাতা মেডিক্যালে নার্স তৃপ্তি বিশ্বাসের মৃত্যু গাফিলতিতে।

৬ অক্টোঃ মেমারি হাসপাতালে জলাতঙ্ক রোগীকে স্পণ্ডিলাইটিসের চিকিৎসা পাঁচ দিন ধরে।

১৩ অক্টোঃ হাওড়ার ৬ মাসের সাবিনা খাতুন টাকার অভাবে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে না পেরে মৃত্যু।

১৩ অক্টোঃ আর জি করে ভর্তি মৌঝুরি ঘোষ মৃত সন্তান প্রসব করেন। সেই শিশুর দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

১৬ অক্টোঃ হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে আন্ত্রিকে আক্রান্ত সাবিনার মাকে বেড দেওয়া হয়নি।

১৭ অক্টোঃ এস এস কে এমে বাগুইহাটির কলেজ ছাত্রী ২০ বছরের সুস্মিতা বিশ্বাসের মৃত্যু, ভর্তি না হতে পেরে।

১৯ অক্টোঃ আর জি করে ভর্তি থাকা ১৮ বছরের নিকুঞ্জ দাসের মৃত্যু, চিকিৎসার অবহেলায়।

১৯ অক্টোঃ বিষ্ণুপুর মহকুমা হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় সাড়ে ছ'বছরের বালকের মৃত্যু।

১৯ অক্টোঃ আসানসোল মহকুমা হাসপাতালে ৫৫ বছরের অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাক থেকে অক্সিজেনের নল খুলে নেওয়ায় রোগীর মৃত্যু।

২১ অক্টোঃ হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে বেড থেকে নিখোঁজ রোগী সন্তোষ হেলার (২৭) মৃতদেহ বাইরে ময়লা ফেলার ভ্যাটের কাছে পাওয়া যায়।

২১ অক্টোঃ কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঁচু হেমব্রম (৩৫) এক সপ্তাহ ভর্তি থাকলেও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয় অভিযোগ।

২৩ অক্টোঃ উত্তরপাড়া জেনারেল হাসপাতালে কম্বল চাপায় এক সদ্যোজাতের মৃত্যু ঘটে।

২৩ অক্টোঃ শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে বাজারের থলের মধ্যে প্লাস্টিকে মোড়া নবজাতকের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

২৩ অক্টোঃ ন্যাশানাল মেডিক্যালে মৃত নবজাতকের ডেথ সার্টিফিকেটে তার মায়ের নাম লেখা হল।

২৪ অক্টোঃ ভাটপাড়া হাসপাতালে ডাক্তার নেই, ফিরিয়ে দিল অসুস্থ শিশুকে। কল্যাণী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে ঐ শিশুর মৃত্যু হয়।

২৫ অক্টোঃ পুরুলিয়া সদর হাসপাতলে অবহেলায় প্রসূতি রূপা চ্যাটার্জীর (২৫) মৃত্যুতে বিক্ষোভ।

২৬ অক্টোঃ শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে মালা সরকার (২৮) শুক্রবার হাসপাতালে সন্তান প্রসব করেন। রবিবার রোগীকে রিলিজ দেওয়ার কথা। ছাড়া পাওয়ার দুঘণ্টা আগে রোগীর মৃত্যু। সকাল ৯টায়।

২৬ অক্টোঃ বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে গোবিন্দ দাস (৮০) চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু।

২৬ অক্টোঃ শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে ইমার্জেন্সিতে দীর্ঘক্ষণ ডাক্তার না থাকায় ভর্তি হতে এসে যন্ত্রণায় ছটফট করে শেষে অনেক দেরিতে ভর্তি হয় ও মারা যান মহম্মদ ইসরাফুল (৪০)।

২৭ অক্টোঃ কাটোয়া হাসপাতাল থেকে বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি পর চিকিৎসার গাফিলতিতে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু।

২৮ অক্টোঃ বনগাঁ হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশুর শরীরে বিড়ালের কামড়।

২৮ অক্টোঃ শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ না থাকায় ৩ বছরের শিশু রোগীকে ফিরিয়ে দেয়।

২৯ অক্টোঃ নীলরতন সরকার হাসপাতালে মর্গে ৩টি মৃতদেহ ইঁদুরে খুবলে খেয়েছে হালিশহরের মৃত শান্তনু চট্টোপাধ্যায় সহ দুজনের।

২৯ অক্টোঃ মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে সুনীল রায়ের ৮ বছরের কন্যা শুক্লা রায়, স্যালাইনের অভাবে মৃত্যু।

২৯ অক্টোঃ এস এস কে এমে আবিরা খাতুনকে মেয়াদ উত্তীর্ণ রক্ত দেওয়া হয়।

২৯ অক্টোঃ নদীয়া তাহেরপুর হাসপাতালে ভর্তি না হতে পেরে পথে সন্তান প্রসব।

২৯ অক্টোঃ পুরুলিয়া ঝালদা কোটশিলা প্রাঃ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৭০০ রোগী আউটডোরে চিকিৎসা করতে আসে — ৩ জন ডাক্তার থাকার কথা, কিন্তু কোনদিন থাকেনা, ১ জন ডাক্তার ছিল, এক ফার্মাসিস্ট ডাক্তারী করে।

৩০ অক্টোঃ বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে প্রসূতি শিউলি বিশ্বাস (২০)। সদ্যোজাত শিশু ও মায়ের মৃত্যু।

৩০ অক্টোঃ আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে রোগী তপন মুখোপাধ্যায় (৩৮), চিকিৎসার অবহেলায় মৃত্যু।

৩০ অক্টোঃ মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাবে জুলফিকর আলি মণ্ডলের (২৪) মৃত্যু।

এতো শুধু প্রকাশিত তথ্য। অপ্রকাশিতের পরিমাণ আরও কত কেউ জানে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে মুখ খুলবেন কি? যদি জনসাধারণের প্রতি ন্যূনতম দরদ থাকত তবে তাঁরা অবিলম্বে সরকারি হাসপাতালের অবস্থা বদলাতে সবরকম চেষ্টা শুরু করতেন। বিশিষ্ট চিকিৎসক, সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলের এবং সব দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে পথ বের করতেন। কিন্তু তা তাঁরা করেন নি। উল্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন — হাসপাতালে মিটিং-মিছিল কোনমতেই বরদাস্ত করা হবে না। অর্থাৎ মানুষ মরুক, কিন্তু মিটিং-মিছিল করে তার প্রতিবাদ করা চলবে না। তা সত্ত্বেও যদি মিটিং মিছিল হয় তবে — অনিল বিশ্বাস বলেছেন — তারা হাসপাতালে রাজনৈতিকভাবে তার মোকাবিলা করবেন। অর্থাৎ ক্যাডার নামক দলীয় ঠ্যাঙাড়ে মোতায়েন করবেন। এই কণ্ঠস্বরের সাথে কিসের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে? হাসপাতালে চিকিৎসার চরম শোচনীয় অব্যবস্থা ও রোগীদের পর পর অসহায় মৃত্যু দেখেও যে সরকার বিবেকের দংশন অনুভব করে না, বরং এই আচরণ করতে পারে, সেই সরকারই কিন্তু মিটিং-মিছিল বন্ধ করার জন্য দ্রুত বামফ্রন্টের মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত করে সঙ্গে সঙ্গে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে তাকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তৎপর। এরপরেও মিটিং-মিছিল বন্ধে জনসাধারণের অসুবিধার যে অজুহাত তারা দিচ্ছে, তার প্রকৃত চরিত্র ও উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

হাসপাতালে অব্যবস্থার প্রতিবাদে

নাগরিক কনভেনশন

সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবহেলায় সাবিনা, সুস্মিতা ও নার্স তৃপ্তি বিশ্বাসদের অকালমৃত্যু এবং রাজ্যের বর্তমান বেহাল স্বাস্থ্যচিত্রের ওপর কলকাতা মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়াম হলে ১ নভেম্বর এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ দত্ত।

কনভেনশনে সকলের জন্য নিঃশুল্ক স্বাস্থ্যপরিষেবার ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে এবং সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে একটি খসড়া প্রস্তাব পাঠ করেন ডাঃ অংশুমান মিত্র। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন আই এম এ-এর পক্ষ থেকে ডাঃ আর ডি দুবে, ডাঃ সুভাষ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক কিশোরশঙ্কর রায়, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার-এর পক্ষ থেকে ডাঃ অশোক সামন্ত, ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ডাঃ বিজ্ঞান বেরা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির প্রতিনিধিরা। বক্তারা বলেন, সরকার অত্যন্ত পরিকল্পিত ও সুচতুরভাবে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বর্তমান বেহাল অবস্থায় নিয়ে এসেছে যাতে স্বাস্থ্যের বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের পথকেই প্রশস্ত করা যায়। গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টারগুলিকে তুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত সরকার নিতে চলেছে তা প্রতিরোধ করতে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার বলে বক্তারা বলেন। হাসপাতালের মধ্যে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষেধ করার এবং রোগী, তাদের আত্মীয়স্বজন, ডাক্তার নার্স ও গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করার সরকারি অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন বক্তারা।

সভায় তৃপ্তি বিশ্বাস, সুস্মিতা ও সাবিনার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন পড়েনা

চারের পাতার পর

দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। এটা করলে এই ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে ৭%-এ নিয়ে এসে সি-ই-এস-সির ৩০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়।

তাছাড়া, সি-ই-এস-সি নিজেই এবার উৎপাদন খরচ বেশি একথা কথা স্বীকার করে তা কমাবার কথা বলছে। এই সংস্থার অদক্ষ প্রশাসকদের মাসিক বেতন লক্ষ লক্ষ টাকা শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য খরচে ঢুকিয়ে দেখানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষ কিন্তু একবারও এই উচ্চ বেতনভুক আমলাদের বেতন কমাবার কথা উচ্চারণ করেনি। এই আমলাদের বেতনহার বি-এস-ই-এস-এর থেকেও বেশি। এই বেতন কমিয়ে কেন সাশ্রয় করা হবে না? এর সাথে যদি সি-ই-এস-সি'র হিসাবের কারচুপি বন্ধ হয়, বাইরে থেকে বিদ্যুৎ কেনা বন্ধ করে খরচ কমানো হয়, আর মূলাজোড় ও কাশীপুর উৎপাদন কেন্দ্রকে সংস্কার করে উন্নত করে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে মূলাজোড় বন্ধ করা এবং ৪৫০০ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই-এর প্রয়োজন থাকে কি? ভাবতে হবে কেন গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ না করে প্রথমেই শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর থাবা বসাতে উদ্যত, কেনই বা ইউনিয়নগুলো এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকারান্তরে মদত যোগাচ্ছে কোম্পানিকে?

প্রকৃতপক্ষে গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী বিদ্যুতের দাম কমানোর ফানুসটি জনসাধারণের সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে গড়ে-ওঠা গ্রাহক আন্দোলনকে দুর্বল করে, বিভ্রান্তি ছড়িয়ে শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই করে আরো মুনাফাবৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আর 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' এই ঘৃণ্য পরিকল্পনার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করছে। যদি তা না হয়, তাহলে সি-ই-এস-সি এই জনস্বার্থবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'ল না কেন?

সকলেই জানেন যে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন রাজনৈতিক দলগুলোর গদি রক্ষাই আজ ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এই গদি রক্ষার তাগিদেই রাজ্য সরকার বহুজাতিক সংস্থা ও গোয়েঙ্কা সহ দেশীয় ধনকুবেরদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। তাই 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' চালু করায় সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩'-এর কোন বিকল্প প্রস্তাব না দিয়ে সাহায্য করেছে এই জনস্বার্থ বিরোধী শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী আইন তৈরি হতে। সেই কারণেই এই রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা পরিচালিত ইউনিয়নগুলির অবস্থা নখদন্তহীন সিংহের মতো। হুঙ্কার আছে, কিন্তু সংগ্রাম নেই। তারা আজ ম্যানেজমেন্টের এজেন্টে পরিণত। তাই আজ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সঠিক নেতৃত্বে যুক্ত আন্দোলনের। চাই গ্রাহক ও শ্রমিক-কর্মচারীর ঐক্য।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

ভুল স্বীকার করলেই হাততালি পাওয়া যায় না

রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আবার বাণী দিয়েছেন। আবার তিনি বলেছেন, 'প্রাথমিক শিক্ষার মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।' বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছেন আড়াই বছরের বেশি সময়। এই সময়ের মধ্যে ঠিক এই বাক্যটি তিনি প্রায় আড়াইশ বার বলেছেন, কিন্তু শিক্ষার উন্নয়ন আড়াই ইঞ্চি ও এগোয়নি, বরং দিনে দিনে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাটা আরও তলিয়ে যাচ্ছে। আসলে 'উন্নয়ন ঘটাতে হবে' কথাটা বারবার আওড়ে তিনি ভাব দেখাতে চান যেন শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল অবস্থা নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত এবং অবস্থা ফেরাবার জন্য সত্যই সচেষ্ট। আন্তরিকতার ভান দেখানোই এখানে মূল লক্ষ্য। যেমন, তিনি বলেছেন, 'প্রয়োজন আছে বলেই ইংরাজি ফিরিয়ে আনছি। ইংরাজি ফিরিয়ে আনা যে দরকার, তা অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।' ভাষা শিক্ষার প্রশ্নে এমন একটা গুরুতর প্রয়োজন বুঝতে, যে শাসক দল ও নেতাদের ২৬ বছর লেগে যায় তাদের সরকারে থাকার কোনও অধিকার, কোনও যোগ্যতা আছে কি? আমাদের মত দেশে ছাত্রছাত্রীদের ইংরাজি ভাষা শেখার জন্য প্রাথমিক স্তর থেকেই তা পড়ানো প্রয়োজন আছে কি নেই, সেটা এমন একটি বিষয় নয়, যা ২৬ বছর আগে মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল কিংবা ভাষাশিক্ষার বিজ্ঞানে যার জবাব ছিলনা। এসবই তখনও জানা ছিল, এখনও আছে। এবং এই সত্যটা বারবার সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের কাছে গণআন্দোলনের মঞ্চ থেকে পেশ করাও হয়েছিল। যেদিন এই সরকার প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি পড়ানো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেদিন থেকেই এই নীতিকে ভ্রান্ত ও সর্বনাশা আখ্যা দিয়ে এই নীতি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিল এস ইউ সি আই। এই দাবিতে সারা রাজ্য জুড়ে সকল অংশের মানুষকে জড়িত করে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন ১৯ বছর ধরে এ রাজ্যে চলেছিল। তাতে ভাষাচার্য সুকুমার সেন, ইতিহাসবিদ্ নীহাররঞ্জন রায়, মনোজ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষের মত বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকরা যোগ দিয়েছিলেন। রাস্তায় নেমে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই দাবিতে মিছিল, কনভেনশন, অবস্থান, আইন অমান্য করা সহ কোটি কোটি মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র সরকারকে দেওয়া হয়েছিল। এই আন্দোলন তথ্য, যুক্তি, ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার সবদিক তুলে ধরেছিল। এই দাবিতে ১৯৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই-এর ডাকা বাংলা বন্ধে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনগণ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা সরকারি শিক্ষানীতির বাতিল চান। ১৯ বছর ধরে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে-ওঠা এই বিপুল ও প্রবল জনমতই শেষপর্যন্ত সরকারকে বাধ্য করে তাদের নীতি পাল্টাতে। তবুও এই সরকার প্রথম শ্রেণীর বদলে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ইংরাজি পড়াবার সিদ্ধান্ত নেয় ২০০১ সালে। সুতরাং, প্রাথমিকে ইংরাজি পড়ানোর প্রয়োজনটা সরকারকে বোঝাবার যথেষ্ট চেষ্টা হয়নি, তা নয়। কিন্তু যতক্ষণ না প্রবল জনমত সরকারকে চেপে ধরেছে, ততক্ষণ সরকার যুক্তি শোনেনি, স্বৈরাচারী শাসকদের মতই সব যুক্তি ও তথ্য উপেক্ষা করেছে। আসলে মুখে মার্কসবাদের বুলি আওড়ে সি পি এম নেতৃত্ব বাস্তবে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস ও সংঘপরিবারের 'আংরেজি হটাও' জিগিরের শরিক হয়েই এ রাজ্যের সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে ইংরাজি শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয় ধনীদের জন্য কুক্ষিগত করেছিলেন। এর দ্বারা লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর যে ক্ষতি তাঁরা করেছেন, তা কখনও পূরণ করা যাবে না। ইংরাজির সাথে প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সরকারি স্কুলগুলিকে যেভাবে তারা ধ্বংস করেছেন, তার পুনরুদ্ধারও তাঁদের দ্বারা অসম্ভব। আজ যে প্রয়োজনের কথা মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তার মধ্যে শিক্ষার মান উন্নয়নের কোনও সদিচ্ছাই নেই। শুধু ইংরাজি ফিরিয়ে আনার দ্বারা শিক্ষার হাল ফিরবেও না। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাথে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির গাঁটছড়া বাঁধবার যে স্কীম তাঁরা নিয়েছেন, তাতে ইংরাজির ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকেই তাঁরা এখন ইংরাজি পড়ানোর কথা বলছেন, শিক্ষার প্রয়োজন থেকে নয়।

সি পি আই (এম)-এর অন্যতম শীর্ষ নেতা জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রীত্বেই প্রাথমিকে ইংরাজি খারিজ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এখন তিনি বলছেন, 'ঐ সিদ্ধান্ত ভুল ছিল।' কিন্তু সরকারের যে 'ভুল সিদ্ধান্তের' জন্য বছরের পর বছর ধরে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মাশুল দিতে হয়, তাকে ২৬ বছর পর ভুল বলে স্বীকার করলেই কি একজন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দায় থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন? এই প্রশ্ন উঠবে বুঝেই তিনি আরও বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি বরাবরই প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি পড়াবার পক্ষে ছিলাম। কিন্তু আমার কথায় তো সিদ্ধান্ত হয়নি। বিভিন্ন কমিশন আরও উঁচু ক্লাস থেকে ইংরাজি পড়ানোর পক্ষে মত দেওয়ায় প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি তুলে দিয়েছিলাম। তখন সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিলনা বলেই এখন বদলাতে হচ্ছে" (বর্তমান ২৯-১০-০৩)। জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রীত্বে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই বহু কমিশন বসানো হয়েছিল, সকল কমিশনের সুপারিশ কি জ্যোতিবাবুরা মেনে ছিলেন? এমনকি ভাষাশিক্ষা বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকারের দ্বারা নিযুক্ত ভবতোষ দত্ত কমিশন তো নীচু ক্লাস থেকে ইংরাজি পড়ানোর পক্ষেই মত দিয়েছিল, জ্যোতিবাবুরা সেটা মানেননি কেন? শুধু পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের বসানো হিমাংশু বিমল মজুমদার কমিশনের মত মেনে তারা প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি পড়ানো বন্ধ করে দিলেন কেন? আসলে কংগ্রেস সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির সাথে সি পি আই (এম) নেতৃত্বের নীতি মিলে গিয়েছিল বলেই তাঁরা এটা করেছিলেন। কমিশন এখানে অজুহাত, আসলে এটা ছিল তাঁদের দলের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয়ত, গত ২৬ বছরে ইতিপূর্বে তিনি একটিবারও বলেননি যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরাজি পড়ানোর পক্ষে। দলীয় শৃংখলা তো তাঁর ক্ষেত্রে কোন বাধা হতে পারে না। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ না দেওয়ার তাঁদের দলীয় সিদ্ধান্তকে তিনি প্রকাশ্যেই সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, 'ঐতিহাসিক ভুল'। ঐক্ষেত্রে দলীয় শৃংখলা যদি তাঁকে আটকাতে না পেরে থাকে, এক্ষেত্রে তা হয় কী করে? শুধু তাই নয়। তাঁদের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে যে বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে যখন তাঁর দলের নেতারা কুৎসিত কটু মন্তব্য করেছিলেন, তখন তাঁর মতো শীর্ষ নেতা বাধা দেননি কেন? তিনি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে থেকেও, ঐ প্রবীণ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের সাথে মতবিনিময় করার, তাঁদের কথা শুনবার সৌজন্যটুকুও দেখাননি কেন? বরং বিধানসভায় ও নানা জনসভায় তিনি নিজে সরকারের ভ্রান্ত ও সর্বনাশা শিক্ষানীতির পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। তাই শুধু নয়, ভাষা আন্দোলনকে 'প্রতিক্রিয়াশীলদের' আন্দোলন বলতেও দ্বিধা করেননি। আজ হঠাৎ বিড়াল তপস্বীর মতো 'ভুল হয়েছে' বললেই তিনি হাততালি পাবেন এবং জনসাধারণ তা বিশ্বাস করবে — একথা ভেবে থাকলে বুঝতে হবে, ইতিহাস থেকে তাঁরা এখনও শিক্ষা নেননি।

আমেরিকা, ফ্রান্স, সিরিয়া, তুরস্ক, কিউবা, আলজিরিয়া, মরিশাস, প্যালেস্টাইন, কঙ্গো, নেপাল, বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশের এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ যোগ দেবেন

আর জি কর ঃ বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাই

দুয়ের পাতার পর

মধ্যে তিনজন আমাদের দলের। এদের একজন ঘটনার দিন ছিলেন, দু'জন আদৌ ছিলেনই না। স্থানীয় সি পি এম কাউন্সিলার এই নামগুলি দিয়েছেন। না হলে, বাইরে থেকে আসা মৃতের আত্মীয়স্বজন এদের নাম জানবেন কী করে? 'গণশক্তি'ই বলেছে, স্থানীয় সি পি এম কাউন্সিলারের সঙ্গে গিয়ে মৃতের আত্মীয়রা এফ আই আর করেছে। এতেই পরিষ্কার, সি পি এমের তরফ থেকেই নামগুলি দেওয়া হয়েছে।

এখানে আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। সংবাদে প্রকাশ, আর জি কর-এ পুলিশের রাইফেল কেড়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শনিবার আমাদের শান্তিপূর্ণ অবরোধে নির্মমভাবে পুলিশ মারল, যাদের গ্রেপ্তার করা হল তাদের ছাড়া হল না, পুলিশ হাজতে রেখে দিল। অথচ আর জি করে যারা এ কাণ্ড ঘটাল তাদের পুলিশ ধরল না। একজনকে ধরে জামিন দিয়ে দিল। কেন পুলিশের এই দু'রকম অ্যাটিচুড? তাই আমরা বলতে চাই — যে শক্তি পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করে তারাই আর জি করের ঘটনা ঠাণ্ডা মাথায় ঘটিয়েছে। হামলা যা হয়েছে তা তাদের দ্বারাই হয়েছে।

এটাও বলতে চাই — মেডিক্যাল শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, ক্যাপিটেশন ফি চালুর যে চেষ্টা সি পি এম করেছিল, তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমাদের এই কর্মীরা, যাদের বিরুদ্ধে এরা এফ আই আর করেছে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে সরকারকে কিছু ফি কমাতে হয়েছে, ক্যাপিটেশন ফি চালু করা এক বছর পেছাতে হয়েছে। আর জি করেই আমাদের দলের কর্মীদের নেতৃত্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। এইসব কারণেই আজ আমাদের কর্মীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর এবং এর দ্বারা আন্দোলনকে আটকানোর একটা ষড়যন্ত্র তারা করেছে।

আমরা এই ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করছি এবং আমরা চাই সেই রিপোর্ট পাবলিকের কাছে আসুক। কারা এই ঘটনা ঘটালো, প্রকৃত দোষী কারা তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া হোক। মানুষ দেখুক, সি পি এম নেতৃত্ব কতটা নীচে নামতে পারে। এই ঘটনা হিটলারের রাইখস্ট্যাগ পুড়িয়ে কমিউনিস্টদের ওপর দোষ চাপানোর ষড়যন্ত্রেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমরা বিশ্বাস করি, দেশের মানুষ সি পি এমের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত ধরতে পেরে গণআন্দোলনের স্বার্থে এর বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবেন।

আমরা মনে করি, পাবলিক ও প্রেস রিপোর্টার-ফটোগ্রাফারদের উপর যে আক্রমণ হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। হাসপাতালের পরিষেবার মানের মারাত্মক অধঃপতন হয়েছে সরকারের চূড়ান্ত জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির জন্য। সরকার বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে ১৪২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। ফ্রি বেড প্রায় তুলে দিয়েছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই, যা আছে তাও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অচল হয়ে আছে। জুনিয়ার ডাক্তারের সংখ্যা অর্ধেক করে দিয়েছে। পথ্য বেসরকারি হাতে দিয়ে দিয়েছে। তিনটি সরকারি হাসপাতাল রাজ্য সরকার বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে। ডাক্তারদের একাংশকে তারাই সুবিধাবাদী বানিয়েছে, নগ্ন দলীয় স্বার্থে তাদের কর্তব্যে অবহেলাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। ডাক্তারদের মধ্যে যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে চেষ্টা করেন, পরিকাঠামোর অভাবে তাঁরা অসহায়। তাঁরা চাইলেও তা করতে পারেন না। তাই জনগণের প্রতি আমাদের আহবান — ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী সকলকে সঙ্গে নিয়ে সরকারের জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলনে এগিয়ে আসুন।

এস ইউ সি আই-এর পক্ষে মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net